ছিল। অনেক সময় বর্ণ এবং শ্রেণী, পরস্পরের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। একান্ত ভাবে কৃষি-নির্ভর অর্থনীতিতে ভূমিই ছিল প্রধান সম্পদ। এবং এই সম্পদের উপর অধিকারের স্তরভেদকে অবলম্বন করে সমাজে শ্রেণী বিভাগ রচিত হয়েছিল। সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-অর্থনীতিতে একদিকে ছিলেন প্রবল প্রতাপ মহাসামন্ত, মহামাণ্ডলিকগণ এবং অন্যদিকে ভূমিহীন প্রজাপুঞ্জ। এই দুই বিপরীত মেরুর মধ্যস্থলে ভূমিস্বত্বাধিকারের নানা স্তর ছিল। শিল্পী, বণিক এবং ব্যবসায়ীগণও ছিলেন। কিন্তু সমাজ-অর্থনীতিতে তাঁদের পূর্ব প্রাধান্য আর ছিল না। রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে একটি কর্মচারি শ্রেণীও গড়ে উঠেছিল। তাঁদের মধ্যেও আবার নানা স্তরভেদ ছিল। একদিকে ছিলেন উপরিক, রাজস্থানীয়, মহাসেনাপতি ইত্যাদি উচ্চপদস্থ কর্মচারিবৃন্দ, অন্যদিকে ছিলেন তরিক, শৌল্কিক, গৌল্মিক, চাটভাট ইত্যাদি ক্ষুদ্র কর্মচারিগণ। বুদ্ধি এবং ধর্মজীবী শ্রেণীতেও স্তরভেদ ছিল। একপ্রান্তে ছিলেন দরিদ্র ব্রাহ্মণ পুরোহিত এবং অন্যপ্রান্তে, ভূমি ও অর্থসমৃদ্ধ রাজপুরোহিত। ভূমিহীন সমাজ-সেবক শ্রেণীর মধ্যেও স্তরভেদ ছিল। এদের বেশির ভাগ ছিল অন্ত্যজ এবং অল্পসংখ্যক মধ্যম-সংকর পর্যায়ের। পাল আমলের উদার বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে চণ্ডাল পর্যন্ত সমাজ দৃষ্টির সামনে উপস্থিত ছিল। কিন্তু সেন আমলে ব্রাহ্মণ্য দৃষ্টিভঙ্গির প্রাধান্যের ফলে তারা আর দৃষ্টিগোচর ছিল না।

পাল ও সেন আমলে ধর্ম

পাল ও সেন আমলে বাঙলাদেশে বিভিন্ন ধর্ম ও সংস্কৃতির স্থান ছিল। পাল রাজাদের সময় বৌদ্ধধর্ম বিশেষ প্রাধান্য অর্জন করেছিল। আবার সেন রাজাদের সময় ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল। পাল রাজাদের সময় বৌদ্ধধর্মের পাশাপাশি জৈনধর্ম এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্ম স্বমহিমায় বিরাজ করত। কিন্তু সেন আমলে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অপ্রতিহত প্রভাবে অন্যান্য ধর্ম ম্রিয়মাণ হয়ে পড়েছিল। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বলতে বৈদিক ধর্ম এবং পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম দুই-ই বোঝাত। পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মধ্যে শৈবধর্ম এবং বৈষ্ণবধর্মই ছিল প্রধান। শৈবদের মধ্যে শাক্তদেরও স্থান ছিল। তৎকালীন বাঙলাদেশে বিভিন্ন দেবদেবী পূজার প্রচলন ছিল। এই দেবদেবীর অসংখ্য মূর্তি পাওয়া গেছে। এই মূর্তিগুলির মধ্যে যেমন শৈব দেবদেবী, কার্তিক, গণেশ এবং দুর্গার বিভিন্ন মূর্তি ছিল, তেমন ইন্দ্র, অগ্নি, কুবের, বৃহস্পতি, গঙ্গা, যমুনা এবং মাতৃকা মূর্তিও ছিল। সূর্য পূজা এবং সূর্য মূর্তিও একেবারে অজ্ঞাত ছিল না।

আর্য ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মূলকথা বৈদিক ধর্ম ও শ্রৌত সংস্কার। পাল আমলে এই ধর্ম ও সংস্কৃতি বাঙলাদেশে শক্তি সঞ্চয় করেছিল। পাল রাজাদের দানপট্টগুলিতে দেখা যায় যে, বেদ, বেদাঙ্গ, মীমাংসা ও ব্যাকরণ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত এবং বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানে দক্ষ ব্রাহ্মণদের ভূমি দান করা হয়েছিল। উদাহরণ হিসাবে দেবপালের মুঙ্গের লেখ, নারায়ণপালের বাদাল স্তম্ভ লেখ এবং মহীপালের বাণগড় লেখর কথা বলা যায়। দর্ভপাণি, কেদার মিশ্র এবং গুরব মিশ্র, সকলেই বেদজ্ঞ ছিলেন। হরিচরিত নামক গ্রন্থের লেখক বলেছেন যে বেদচর্চায় রত জনৈক ব্রাহ্মণকে ধর্মপাল ভূমি দান করেছিলেন। নারায়ণপালের ভাগলপুর লেখ-তে বেদ-বেদাঙ্গে পারঙ্গম জনৈক ব্রাহ্মণের উল্লেখ আছে। পাল রাজাদের কয়েকটি লেখ থেকে জানা যায় যে ভারতের নানা স্থান, বিশেষত

মধ্যদেশ থেকে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ এসে বাঙলাদেশে বাস করেছিলেন। তাঁদের কল্যাণে এখানে বৈদিক ধর্মে নূতন প্রাণের সঞ্চার হয়েছিল।

সেন পর্বে বাঙলাদেশে বৈদিক ধর্ম ও সংস্কার আরও বিস্তৃত এবং সুদৃঢ় হয়েছিল। সামন্তসেনের বানপ্রস্থ যে আশ্রমে কেটেছিল, তার পরিবেশ ছিল বৈদিক। কল্পিত সেই আশ্রমে শুক পাখিরাও বেদ আবৃত্তি করত। সেন রাজাদের বিভিন্ন লেখ-তে দেখা যায় যে, চতুর্বেদের বিভিন্ন শাখাধ্যায়ী ব্রাহ্মণগণ হোম, যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠানের জন্য ভূমি-দক্ষিণা লাভ করতেন। বাঙলার শ্রৌত ও স্মৃতিশাস্ত্র এই আমলের সৃষ্টি। ভট্ট ভবদেব, জীমূতবাহন, অনিরুদ্ধ ভট্ট, বল্লালসেন, লক্ষ্মণসেন, হলায়ুধ ইত্যাদি সকলেই শ্রৌত ও স্মৃতি পণ্ডিত। এই যুগেই বাঙলার ব্রাহ্মণ্যজীবন সর্বভারতীয় শ্রৌত ও স্মৃতি বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল। এই স্মৃতিকারদের গ্রন্থে গর্ভাধান থেকে বিবাহ পর্যন্ত যে বিভিন্ন সংস্কারের কথা জানা যায়, তার প্রত্যেকটি পালনের অপরিহার্য অঙ্গ ছিল বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ।

বৌদ্ধ পাল রাজাদের সময় পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ধ্যান-ধারণা বিস্তৃত হয়েছিল। পাল যুগের লেখগুলির উপমা, অলঙ্কার, চিত্রকল্প প্রভৃতি সবই যে পৌরাণিক গ্রন্থাদি থেকে গৃহীত, সে কথা পূর্বে বলা হয়েছে। পৃথু, ধনঞ্জয়, সগর, নল, যযাতি প্রভৃতি পৌরাণিক বীরেরা তৎকালীন উচ্চকোটী বাঙালীর এবং রাষ্ট্রনায়কদের কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করেছিল। রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণ পাঠ তখন অনেক ব্রাহ্মণের বৃত্তি ছিল। এই পর্বে ইন্দ্র ছিলেন দেবরাজ এবং তাঁর পত্নী পৌলোমী ছিলেন পাতিব্রত্যের আদর্শ। পৌরাণিক শিব কাহিনীও তখন অজ্ঞাত ছিল না। দক্ষযজ্ঞে সতীর অকালে প্রাণত্যাগ এবং শিব-পত্নী উমার পাতিব্রত্য সেই কাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। পৌরাণিক কাহিনীর বিষ্ণু-কৃষ্ণ এ যুগেও ছিলেন। তবে এ যুগে কৃষ্ণ কল্পনা পরিবর্তিত হয়েছিল। এখন আর তিনি ভাগবদ্ধর্মের বাসুদেব নন। এখন তিনি কৃষ্ণ। শ্রীপতি, ক্ষমাপতি, জনার্দন, হরি, মুরারি ইত্যাদি তাঁর বিভিন্ন নাম। এদের প্রত্যেকটির সঙ্গে পুরাণ কাহিনী জড়িত। এই পৌরাণিক দেব-দেবী শুধু লেখ-তে উল্লিখিত হয়েছিলেন, এমন নয়। তাঁদের বিচিত্র ধরনের প্রতিমাও তখন নির্মিত হয়েছিল।

সেন পর্বে পৌরাণিক ধর্ম ও সংস্কারের বিস্তার অব্যাহত ছিল। পুরাণ কাহিনীর পরিচয় এই আমলের লেখ-তেও পাওয়া যায়। বিষ্ণুর বিভিন্ন অবতারের কথাও শোনা যায়। লক্ষ্মণসেনের তর্পণদীঘি লেখ এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। শিব যে অর্ধনারীশ্বর, শম্ভু, ধূর্জটি ও মহেশ্বর যে তাঁর অপর তিন নাম এবং কার্তিকেয় ও গণেশ যে তাঁর দুই পুত্র, এ সবের উল্লেখ নৈহাটি, দেওপাড়া ও বারাকপুর লেখ-তে আছে। এই আমলের কালবিবেক, দায়ভাগ প্রভৃতি গ্রন্থে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম অনুমোদিত বিভিন্ন ক্রিয়া-কর্মের (যেমন কোজাগরী-পূর্ণিমা, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া, আকাশ-প্রদীপ, দীপান্বিতা, জন্মাষ্টমী, অশোকাষ্টমী, অক্ষয় তৃতীয়া, মাঘীসপ্তমী স্নান ইত্যাদি) বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়।

অষ্টম শতাব্দী থেকে বাঙলাদেশে বৈষ্ণব ধর্মের অগ্রগতির সংবাদ বিভিন্ন লেখ-তে পাওয়া যায়। ধর্মপালের খলিমপুর লেখ-তে নন্ন নারায়ণের এক দেবকুলের উল্লেখ আছে। এই নন্ন নারায়ণ হয়ত নন্দনারায়ণের অপভ্রংশ। নারায়ণপালের রাজত্বকালে দিনাজপুরের একটি গ্রামে একটি গরুড় স্তম্ভ স্থাপিত হয়েছিল। এই স্তম্ভ গাত্রেই বাদাল প্রশস্তি উৎকীর্ণ। বাঙলাদেশে পালপর্বের যত প্রতিমা পাওয়া গেছে, তার মধ্যে বৈষ্ণব

পরিবারের মূর্তির সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি। বিষ্ণুর দুই পত্নী, লক্ষ্মী এবং সরস্বতী, গরুড়, বিষ্ণু-কৃষ্ণের দ্বাদশ অবতার এবং ব্রহ্মা এই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। প্রথম মহীপালের রাজত্বের তৃতীয় বৎসরে ত্রিপুরা জেলার বাঘাউড়া বা তার নিকটবর্তী গ্রামে একটি বিষ্ণুমূর্তির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। মহাযান বৌদ্ধধর্ম তখন বাঙলাদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং তার প্রতিমা লক্ষণও সুপরিচিত। পালপর্বের কয়েকটি বিষ্ণুমূর্তিতে তার প্রভাব সুস্পষ্ট।

মহাযানী মূর্তি কল্পনার প্রভাব সেন পর্বের কয়েকটি বিষ্ণুমূর্তিতেও পাওয়া যায়। তবে বিষ্ণুর লক্ষ্মী-নারায়ণ রূপই হয়ত এই সময় বৈষ্ণব দেব-দেবী রূপ কল্পনার অন্যতম প্রধান দান। পূর্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের কয়েকটি স্থানে এই মূর্তি পাওয়া গেছে। মনে হয় দক্ষিণ ভারত থেকে এই রূপ কল্পনা এখানে এসেছিল। পবনদূত কাব্যে এমন ইঙ্গিত করা হয়েছে যেন লক্ষ্মী-নারায়ণ ছিলেন সেন রাজাদের কুলদেবতা। এই পর্বের কয়েকটি অবতার মূর্তি, বিশেষত বরাহ ও নরসিংহ মূর্তি বাঙলাদেশের নানা স্থানে পাওয়া গেছে। লক্ষ্মণসেন পরম নারসিংহ বলে নিজের পরিচয় দিতেন। তিনি ছিলেন পরম বৈষ্ণব। বিজয়সেন নিজে সদাশিবের ভক্ত হয়েও প্রদ্যুম্নেশ্বরের (হরিহরের) মন্দিরে ভূমি দান করেছিলেন। বিশ্বরূপসেন এবং কেশবসেন নারায়ণকে আহ্বান করে তাঁদের রাজপট্ট আরম্ভ করেছিলেন। বৈষ্ণব ধর্মের ইতিহাসে সেন পর্বের দুইটি অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। একটি বিষ্ণুর দশাবতারের সমন্বিত রূপ এবং অন্যটি কৃষ্ণের ধ্যান ও রূপ কল্পনা। গুপ্ত যুগের লেখ-তে কয়েকটি অবতারের উল্লেখ আছে। কিন্তু দশাবতারের বিধিবদ্ধ এবং সমন্বিত উল্লেখ সেখানে নেই। এই উল্লেখ প্রথম পাওয়া যায় জয়দেবের গীতগোবিন্দে এবং শ্রীধর দাসের সদুক্তিকর্ণামৃত গ্রন্থে। গীতগোবিন্দে রাধাকৃষ্ণের ধ্যান কল্পনাও বোধ হয় প্রথম পাওয়া যায়।

পাল পর্বের কয়েকটি লেখ-তে শিবপূজার পরিচয় পাওয়া যায়। ধর্মপালের খলিমপুর লেখ-তে একটি চতুর্মুখ শিবমূর্তি প্রতিষ্ঠার উল্লেখ আছে। ভাগলপুর লেখ-তে নারায়ণপাল কর্তৃক শিবভট্টারক এবং তাঁর সেবকদের জন্য ভূমিদানের কথা আছে। রামপাল রামাবতীতে শিবের তিনটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই পর্বে বাঙলাদেশে শৈবধর্ম বলতে অনেকাংশে পাশুপত ধর্ম বোঝাত। গুপ্ত পরবর্তীকালে আর্যাবর্তের পাশুপতধর্মী ব্রাহ্মণগণ বাঙলাদেশে এসে এই ধর্ম প্রচার করেছিলেন।

এই পর্বে লিঙ্গরূপী শিবের পূজা বিশেষ প্রচলিত ছিল। এই লিঙ্গ সাধারণত একমুখ লিঙ্গ হলেও, চতুর্মুখ লিঙ্গ একেবারে বিরল ছিল না। শিবের অন্যান্য মূর্তি যা পাওয়া গেছে, তাদের মধ্যে চন্দ্রশেখর, নৃত্যরত, সদাশিব, উমা-মহেশ্বর, অর্ধনারীশ্বর এবং শিব-বিবাহ মূর্তিই প্রধান। নটরাজ শিবের মূর্তি বাঙলাদেশে প্রচুর। রুদ্র-শিবের বটুক-ভৈরব এবং অঘোর-রুদ্র রূপের সঙ্গেও তখন বাঙালীর পরিচয় ছিল। তবে তাঁদের বেশি মূর্তি পাওয়া যায়নি। রাজশাহী জেলার দেওপাড়া এবং পার্বত্য ত্রিপুরার উনকোটি তখন শৈব তীর্থ হিসাবে বিখ্যাত ছিল।

শৈব ধর্ম আলোচনা কালে শাক্ত ধর্মের প্রসঙ্গ এসে পড়ে। অষ্টম শতকের পূর্বে বাঙলাদেশের নানা জায়গায় শক্তিপূজার প্রচলন হয়েছিল। সম্ভবত অন্যান্য ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সঙ্গে শাক্তধর্মও এখানে এসেছিল এবং এই অঞ্চল পরে শাক্তধর্মের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পাল ও সেন আমলের লেখ-তে শাক্ত ধর্মের অস্তিত্বের কোন নিশ্চিত

প্রমাণ পাওয়া যায় না, সত্য। তবে শক্তির ধ্যান ও কল্পনাকে আশ্রয় করে যে পরবর্তীকালে তন্ত্রধর্ম ও তন্ত্র-সাহিত্য গড়ে উঠেছিল, তাও মিথ্যা নয়। তন্ত্রধর্মের পরিপূর্ণ বিকাশ বাঙলাদেশেই হয়েছিল। তন্ত্র সাহিত্যেরও বেশির ভাগ এখানেই রচিত হয়েছিল। দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী কোন তন্ত্র-গ্রন্থ পাওয়া যায় নি। কিন্তু পাল আমলের শাক্ত দেবদেবীর রূপ কল্পনায় তান্ত্রিক ব্যঞ্জনা একেবারে ছিল না, তা বলা যায় না।

বাঙলাদেশে যত দেবী মূর্তি পাওয়া গেছে, তার মধ্যে চতুর্ভুজা ও দণ্ডায়মান মূর্তির সংখ্যাই বেশি। দেবীর উপবিষ্ট মূর্তি অপেক্ষাকৃত কম। রুদ্র দেবী মূর্তির মধ্যে মহিষ-মর্দিনী দুর্গাই প্রধান। তাঁর প্রতিমা বাঙলাদেশে অনেক পাওয়া গেছে।

সেন বংশের পারিবারিক দেবতা বোধহয় ছিলেন সদাশিব। বিজয়সেন শিবের আবাহন করেছিলেন শম্ভু নামে, বল্লালসেন করেছিলেন ধূর্জটি এবং অর্ধ-নারীশ্বর নামে। সেন বংশের প্রথম দিকের রাজারা শৈব ছিলেন, কিন্তু পরবর্তী রাজারা ছিলেন বৈষ্ণব। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁদের সরকারি মোহরে সদাশিবের মূর্তি খোদাই করা ছিল। লক্ষ্মণসেন এবং তাঁর দুই পুত্র তাঁদের লেখ-তে নারায়ণের আবাহন করলেও, সদাশিবকে শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন। সেনদের লেখ-তে তন্ত্রোক্ত শিব-শক্তি সাধনার কোন পরিচয় নেই। তবে তাঁদের লেখ-তে, ও সমসাময়িক সাহিত্যে আগম ও তন্ত্রশাস্ত্রের চর্চার উল্লেখ আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, ভবদেব ভট্ট দাবি করেছেন যে, অন্যান্য শাস্ত্রের সঙ্গে তিনি তন্ত্র ও আগম শাস্ত্রেও পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। পাল পর্বের মত সেন পর্বেও শিবের ভিন্ন ভিন্ন রূপের প্রতিমা বাঙলাদেশের বিভিন্ন স্থানে পাওয়া গেছে। শক্তি প্রতিমা সম্পর্কেও একই কথা বলা যায়।

গুপ্ত-পূর্ব যুগ থেকেই বাঙলাদেশে সূর্য পূজার প্রচলন ছিল। পাল এবং সেনদের আমলে এই পূজা ব্যাপক হয়েছিল। বাঙলাদেশের বিভিন্ন স্থানে প্রাপ্ত অসংখ্য সূর্য মূর্তি তার প্রমাণ। সেন পর্বে সৌরধর্ম রাজবংশের পোষকতা লাভ করেছিল। বিশ্বরূপসেন এবং কেশবসেন "পরম সৌর" ছিলেন। সূর্য প্রতিমা পূজার জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ হয়ত এই ছিল যে, সূর্যকে সকল রোগের আরোগ্যকর্তা মনে করা হত। দিনাজপুর জেলার বৈরহাট্টা গ্রামের একটি সূর্যমূর্তির পাদপীঠে "সমস্ত রোগানাম হর্তা" কথাগুলি আছে। প্রচলিত ঐতিহ্য অনুসারে প্রাচীন পারসীক পুরোহিত (মগ) গণ ভারতে সূর্য পূজার প্রবর্তন করেন। আলবেরুণী তৎকালীন ভারতে এই মগগণের অস্তিত্বের কথা বলেছেন। বাঙলাদেশে যে সূর্য মূর্তিগুলি পাওয়া গেছে, তাদের সকলেরই পায়ে লম্বা বুট জুতো। এ নিঃসন্দেহে সূর্য দেবতার বৈদেশিক উৎসের স্মারক। পাল ও সেন পর্বের সূর্য প্রতিমায় পারসীক ধ্যান কল্পনা অবশ্যই ছিল, কিন্তু তার সঙ্গে বৈদিক ও ব্রাহ্মণ্য ধ্যান-ধারণা মিশে গিয়েছিল। ঋক্‌বেদ-সংহিতায় সূর্যের অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল বলেই তা সম্ভব হয়েছিল। সেনদের লেখ-তে সূর্যকে "বেদবৃক্ষের আশ্চর্য পক্ষী" বলা হয়েছে।

বাঙলাদেশে শুধু অসংখ্য সূর্য মূর্তিই পাওয়া যায়নি। তাঁর পুত্র রেবন্তের মূর্তিও পাওয়া গেছে।

দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্বে বাঙলাদেশে শৈব দেবদেবী, কার্তিক, গণেশ এবং দুর্গার মূর্তি ভিন্ন ইন্দ্র, অগ্নি, কুবের, বৃহস্পতি, গঙ্গা, যমুনা এবং মাতৃকা মূর্তি পাওয়া গেছে। তবে এঁদের প্রত্যেককে কেন্দ্র করে স্বতন্ত্র ধর্ম বিশ্বাস গড়ে উঠেছিল কিনা বলা যায় না।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে এঁদের লোকায়ত ধর্মের সৃষ্টি মনে করা হয়, কিন্তু পরবর্তীকালে এঁরা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন।

হিউয়েন সাঙের পরে বাঙলাদেশে জৈনধর্মের কী অবস্থা ছিল তা জানবার জন্য কোন গ্রন্থ বা লেখ পাওয়া যায়নি। তবে জৈনধর্ম যে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়নি, বিভিন্ন জৈন মূর্তি থেকে তা জানা যায়। এই মূর্তিগুলি পাল ও সেন আমলের। বাঁকুড়া, বীরভূম, পুরুলিয়া এবং সুন্দরবন অঞ্চলে এই মূর্তিগুলি পাওয়া গেছে। অধিকাংশ মূর্তি পার্শ্বনাথের। মূর্তিগুলি প্রায় সবই দিগম্বর জৈন সম্প্রদায়ের। দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বাঙলাদেশের অঞ্চল বিশেষে জৈনধর্মের অস্তিত্ব থাকলেও, পালদের আমলেই তার প্রভাব হ্রাস পেয়েছিল। কেন এ রকম হয়েছিল, তার প্রকৃত কারণ জানা যায় না।

সেন আমলে বাঙলাদেশে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরভ্যুদয় ঘটেছিল, সে কথা সেন রাজাদের ইতিহাস এবং পাল-সেন পর্বে বাঙলার বর্ণ বিন্যাস প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। পাল আমলের সব রাজাই বৌদ্ধ ছিলেন। কিন্তু সেন আমলের সব রাজাই ছিলেন ব্রাহ্মণ্যধর্মাশ্রয়ী। পাল রাজাদের ধর্ম বিষয়ে উদারতা ছিল। তাই তাঁরা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে পাল পর্বের শেষ দিকেই ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরুভ্যুদয়ের সূচনা হয়েছিল। পূর্বেই বলা হয়েছে যে দক্ষিণ ভারত থেকে আগত সেন রাজাদের ধর্ম সম্পর্কে উদারতার অভাব ছিল। তাই তাঁদের সময় বাঙলাদেশে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের নিরঙ্কুশ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সেন আমলে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ছিল বেদ-পুরাণ-শ্রুতি-স্মৃতি শাসিত এবং তন্ত্রদ্বারা উদ্বুদ্ধ। সেন রাজাদের শাসনকালে বাঙলাদেশে জৈনধর্মের অস্তিত্ব প্রায় লোপ পেয়েছিল। বিভিন্ন বৌদ্ধ যান তখনও ছিল, কিন্তু তাদের পূর্ব গৌরব আর ছিল না। এই পর্বে বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্তি সংখ্যায় অতি অল্প। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ তখনও ছিলেন। কিন্তু তাঁদের বেশির ভাগ হয় গুহ্য সাধনায় মগ্ন ছিলেন, না-হয় ব্রাহ্মণ্য ধর্মের গুহ্য সাম্প্রদায়িক সাধনায় আত্মগোপন করেছিলেন। বৌদ্ধ বিহারগুলি ছিল ম্রিয়মাণ। কিন্তু অন্যদিকে বৈদিক যাগযজ্ঞের বিরাম ছিল না। পৌরাণিক দেবদেবীর মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছিল। বিশেষ বিশেষ তিথিনক্ষত্রে স্নান-দান-ধ্যান ইত্যাদি ক্রিয়াকর্মের অবধি ছিল না। মধ্যদেশ থেকে নিরন্তর ব্রাহ্মণগণ এসেছিলেন। রাষ্ট্রে ও সমাজে ব্রাহ্মণের একক আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরভ্যুদয়ের সূচনা হয়েছিল সমকালীন বর্মন রাজ বংশে। এই রাজ বংশের মন্ত্রী স্মার্ত পণ্ডিত ভবদেব ভট্ট ছিলেন এই ধর্মের প্রধান উদগাতা। ভট্ট ভবদেবের লেখ-তে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ অধ্যুষিত একশত গ্রামের উল্লেখ আছে। বর্মন রাষ্ট্রে যার সূচনা, সেন রাষ্ট্রে তাই বিস্তার লাভ করেছিল। বাঙলার স্মৃতি ও ব্যবহার শাস্ত্র সেন আমলের সৃষ্টি। বিজয়সেন এবং বল্লালসেন শৈব, লক্ষ্মণসেন পরম বৈষ্ণব। বিশ্বরূপসেন এবং কেশবসেন ছিলেন নারায়ণ এবং সূর্য ভক্ত। সামন্তসেন শেষ বয়সে গঙ্গা তীরে আশ্রমে বাস করেছিলেন। শুক পাখিরা সেখানে বেদ আবৃত্তি করত। বিজয়সেনের দাক্ষিণ্যে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ প্রচুর ধন লাভ করেছিলেন। তাঁর পত্নী হোম অনুষ্ঠানের দক্ষিণাস্বরূপ ব্রাহ্মণকে ভূমি দান করেছিলেন। লক্ষ্মণসেনের নৈহাটি লেখ অর্ধনারীশ্বরকে বন্দনা করে আরম্ভ হয়েছিল। তাঁর আনুলিয়া লেখর দান-গ্রহীতা ছিলেন একজন ব্রাহ্মণ। গোবিন্দপুর লেখর দান-গ্রহীতাও তাই ছিলেন। তাঁর মাধাইনগর লেখ থেকে জানা যায় যে, তিনি তাঁর অভিষেকের সময় অথর্ববেদীয় ব্রাহ্মণকে ভূমি দান করেছিলেন। কেশবসেন

অনুষ্ঠিত যজ্ঞের ধোঁয়া আকাশ আচ্ছন্ন করত। তিনি তাঁর জন্মদিনে একটি গ্রাম ব্রাহ্মণকে দান করেছিলেন। বিশ্বরূপসেনও ব্রাহ্মণকে ভূমি দান করেন। হলায়ুধ যে প্রচুর পরিমাণ ভূমির অধিকারী হয়েছিলেন, সেকথা পূর্বে বলা হয়েছে। উত্তরায়ণ সংক্রান্ত, চন্দ্রগ্রহণ ইত্যাদি ছিল এই ভূমিদানের উপলক্ষ। রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ কালিদাস যে প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য আদর্শের কথা বলেছিলেন, সেন রাজারা সমাজ ও ধর্মজীবনে তাই পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন।

সেন আমলে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরভ্যুদয়ের বিষয় আলোচনার পর অষ্টম শতাব্দী থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাঙলাদেশে বৌদ্ধধর্মের অবস্থা কী ছিল এবং এই ধর্মে কী পরিবর্তন ঘটেছিল, যার ফলে সহজযানের উৎপত্তি এবং প্রসার সম্ভব হয়েছিল, তাই আলোচনা করা প্রয়োজন।

পাল রাজত্ব আরম্ভ হওয়ার পূর্বে, সপ্তম শতাব্দীতে, সমগ্র বাঙলাদেশে বৌদ্ধধর্মের বিশেষ সমৃদ্ধি ঘটেছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে অষ্টম শতাব্দীতে বৌদ্ধ পালবংশের প্রতিষ্ঠা হয়ত একটি আকস্মিক ঘটনা ছিল না।

পাল রাজারা সাধারণভাবে বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁদের সময় দীর্ঘ চার শতাব্দী ধরে বাঙলাদেশ বৌদ্ধধর্মের শেষ আশ্রয়স্থল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পাল রাজাদের ইতিবৃত্ত আলোচনার সময় তাঁদের ধর্মীয় পৃষ্ঠপোষকতার কথা বলা হয়েছে। ধর্ম বিষয়ে পাল রাজাদের উদার মনোভাব ছিল। তাই তাঁরা ব্রাহ্মণ্য ধর্মেরও পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। তাঁদের সময় ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ ছিল। পাল আমলের অসংখ্য ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর মূর্তি তার নিশ্চিত প্রমাণ। তবুও একথা সত্য যে, পাল পর্বে বৌদ্ধধর্ম কেবল বাঙলাদেশে নয়, সমগ্র পূর্ব ভারতে অভূতপূর্ব গৌরব ও সমৃদ্ধি অর্জন করেছিল। ভারতের বাইরে, আন্তর্জাতিক বৌদ্ধধর্মের ক্ষেত্রেও তখন বাঙলাদেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। তিব্বতের বৌদ্ধধর্মের রূপ ও রীতি বাঙলাদেশই নির্ধারণ করেছিল। যবদ্বীপ এবং সংলগ্ন অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের দায়িত্ব বাঙলাদেশ গ্রহণ করেছিল। এক কথায় তিব্বত থেকে মলয় উপদ্বীপ পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগে বৌদ্ধধর্ম বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিল। (দেবপাল-বলপুত্রদেব সম্পর্ক স্মরণীয়)।

পাল রাজারা ধর্ম বিষয়ে পরমত সহিষ্ণু ছিলেন। তাঁরা অনেকে ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর মন্দির এবং মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁদের দান-গ্রহীতাদের মধ্যে ব্রাহ্মণগণও ছিলেন। ধর্মপাল এবং তৃতীয় বিগ্রহপাল বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা রক্ষায় সচেষ্ট হয়েছিলেন। নারায়ণপাল শিব মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি তাঁর মন্ত্রীদের গৃহে বলিদান প্রত্যক্ষ করতেন। মদনপালের প্রধানা মহিষী, চিত্রমতিকা মহাভারত পাঠ শুনতেন।

হিউয়েন সাঙ বাঙলাদেশে ৭০টি বৌদ্ধ বিহার এবং ৩০০টি দেব মন্দির দেখেছিলেন। প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান থেকে মনে হয় যে, এই সংখ্যা আরও বেশি ছিল। বিক্রমশিলা, ওদন্তপুরি এবং সোমপুর বিহারের কথা পূর্বে বলা হয়েছে। বিক্রমশিলা এবং নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ভৌগোলিক দিক থেকে বাঙলাদেশের বাইরে হলেও, পাল সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। দুইজন বাঙালী পণ্ডিত, শীলভদ্র এবং দীপঙ্কর এদের অধ্যক্ষ ছিলেন। বিক্রমশিলার পাশে নালন্দার গৌরব তখন ম্লান মনে হয়েছিল। ওদন্তপুরি বিহারের আদলে তিব্বতের একটি বিহার নির্মিত হয়েছিল। অন্যান্যদের মধ্যে ত্রৈকূটক (সম্ভবত

রাঢ় অঞ্চলে), দেবী কোট(উত্তরবঙ্গে),পণ্ডিতা (চট্টগ্রামে), সয়গর (পূর্ব ভারতে), ফুল্লহরি (মুঙ্গেরের নিকট), পত্তিকেরা (ত্রিপুরা), বিক্রমপুরী (বিক্রমপুর, ঢাকা) এবং জগদ্দল (বরেন্দ্রীতে) বিহার সমধিক বিখ্যাত। এই বিহারগুলিতে সাধারণ ভাবে এবং জগদ্দল মহাবিহারে বিশেষ ভাবে তিব্বতী পণ্ডিতগণ বৌদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থাদি অনুবাদে নিযুক্ত ছিলেন।

সেন পর্বে বৌদ্ধধর্ম ও দেবদেবীর প্রভাব বিশেষ ভাবে হ্রাস পেয়েছিল। অল্পসংখ্যক বিহার তখনও ছিল। অভয়াকর গুপ্তের মত ধর্মাচার্যও ছিলেন। কিন্তু তাঁদের পূর্ব প্রভাব আর ছিল না। সেন রাজারা বৌদ্ধদের উৎপীড়ন করেন নি। তবে বৌদ্ধদের সম্পর্কে তাঁদের মনে অশ্রদ্ধা ছিল। বেদ বিদ্যাকে তখন পুরুষের আবরণ এবং তার অভাবে পুরুষ নগ্ন, মনে করা হত। বৌদ্ধদের 'পাষণ্ড' আখ্যা দেওয়া প্রায় রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বল্লালসেন তাঁর দানসাগর গ্রন্থে ঘোষণা করেন যে, নাস্তিকদের, অর্থাৎ বৌদ্ধদের পদোচ্ছেদের জন্য তাঁর আবির্ভাব হয়েছিল। লক্ষ্মণসেন বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে এতটা বিদ্বেষ পোষণ করতেন না। তাঁর তর্পণদীঘি লেখতে বৌদ্ধ বিহারের সংবাদ আছে। তবে মোটামুটিভাবে বলা যায় যে সেন রাজ্যের পরিমণ্ডল বৌদ্ধধর্মের পক্ষে অনুকূল ছিল না। বাঙলাদেশে বৌদ্ধধর্মের অবনতির এটি একটি প্রধান কারণ। কিন্তু এই একমাত্র কারণ নয়। বাঙলাদেশে বৌদ্ধধর্মের প্রকৃতি পরিবর্তন, আরও একটি কারণ। এই পরিবর্তন ঘটিয়েছিল সহজযান এবং কালচক্রযান।

হিউয়েন সাঙ সপ্তম শতাব্দীতে যে বৌদ্ধধর্মের বর্ণনা করেছিলেন , পাল পর্বের বৌদ্ধ-ধর্ম ঠিক তা ছিল না। পাল রাজারা নিজেদের "পরম সৌগত" আখ্যা দিয়েছিলেন। তাঁরা তাঁদের লেখ-তে যে ভাবে বুদ্ধের প্রতি আবাহন জানিয়েছিলেন, তা দেখে মনে হয় যে, তাঁদের ধর্ম ছিল মহাযান বৌদ্ধধর্ম। কিন্তু পাল আমলের বৌদ্ধধর্মকে বিশুদ্ধ মহাযান আখ্যা দেওয়া যায় না। মহাযান বৌদ্ধধর্মে তখন নূতন দার্শনিক তত্ত্বের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। এর ফলে যে নূতন বৌদ্ধধর্মের সৃষ্টি হয়েছিল, তাকে বলা হয় বজ্রযান বা তন্ত্রযান বা তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম। (এই খণ্ডে অন্যত্র বৌদ্ধধর্ম প্রসঙ্গে বজ্রযানের কথা বলা হয়েছে।) সম্ভবত এই ধর্মের উৎপত্তি হয়েছিল বাঙলাদেশে এবং পরে তা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই ধর্মান্দোলনের নেতাদের বলা হত সিদ্ধ অথবা সিদ্ধাচার্য। ঐতিহ্য অনুসারে তাঁদের সংখ্যা ছিল চুরাশি।

বজ্রযান ছিল রহস্যময় বৌদ্ধধর্মের একটি রূপ। এর অপর দুইটি আকারকে বলা হত সহজযান এবং কালচক্রযান। বজ্রযান শুধু সেইসব অনুষ্ঠানের উপরই গুরুত্ব আরোপ করেছিল, যাদের রহস্যময় দিক ছিল। রহস্যময়তার দিক থেকে সহজযান ছিল আরও অগ্রসর। তাতে অনুষ্ঠানের কোন স্থান ছিল না। তিব্বতী ঐতিহ্য অনুসারে কালচক্রযান ছিল বিদেশাগত। পালদের সময় তার আবির্ভাব ঘটেছিল। অন্য দুইটি যানের মত কালচক্রযানও যোগকে বড় স্থান দিত, কিন্তু মুহূর্ত এবং তিথির উপর এর জোর ছিল সবচেয়ে বেশি। তিনটি যানেরই লক্ষ্য ছিল অভিন্ন, মহাসুখ লাভ। বৌদ্ধধর্মের এই পরিবর্তনের ফলে হিন্দু ধর্ম এবং গৌড়া বৌদ্ধধর্মের মধ্যে ব্যবধান কমে ছিল এবং উভয়ের সমন্বয়ের পথ প্রস্তুত হয়েছিল। সিদ্ধাচার্যগণ এর সহায়ক ছিলেন।

মোটামুটিভাবে মনে করা হয় যে, দশম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে এই সিদ্ধাচার্যগণ ছিলেন। তাঁদের মধ্যে যাঁরা প্রধান, তাঁরা হলেন সরহ, নাগার্জুন, তিল্লোপাদ, নারো-পাদ, অদ্বয়বজ্র এবং কাহ্নপাদ। বৌদ্ধ ঐতিহ্য অনুসারে জনৈক ওড়িশার রাজা সরহকে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করেন। পরে তিনি নালন্দায় সম্মানের আসন লাভ করেছিলেন। নাগার্জুন ছিলেন সরহের শিষ্য। তিল্লোপাদ ছিলেন চট্টগ্রামের ব্রাহ্মণ এবং রাজা মহীপালের সমকালীন। নারো-পাদ বরেন্দ্রভূমির অধিবাসী এবং নয়াপালের সমকালীন ছিলেন। প্রখ্যাত নৈয়ায়িক, জেতারি তাঁর গুরু ছিলেন। অতীশ দীপঙ্করের আবির্ভাবও এই সময় হয়েছিল।

মহাযান বৌদ্ধধর্মে প্রকাশের মাধ্যম ছিল সংস্কৃত। সিদ্ধাচার্যগণ প্রকাশের মাধ্যম হিসাবে অপভ্রংশ এবং বঙ্গভাষাকে গ্রহণ করেছিলেন। অপভ্রংশ কৃত্রিম হওয়ায় ধীরে ধীরে বঙ্গভাষার প্রাধান্য এসেছিল। বঙ্গভাষায় তাঁদের সঙ্কলন গ্রন্থ, চর্যাচর্যবিনিশ্চয়। এই সিদ্ধাচার্যগণ অপভ্রংশ এবং সংস্কৃতেও গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। অধুনা তাদের তিব্বতী অনুবাদই টিঁকে আছে। তিব্বতী অনুবাদে মোট ৫৩টি গ্রন্থের নাম পাওয়া যায়। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সরহ এবং কৃষ্ণের দুইটি দোহাকোষ উদ্ধার এবং প্রকাশ করেন। ডঃ বাগচি তিল্লোপাদের একটি দোহাকোষের পাণ্ডুলিপি, সরহের অপর দুইটি দোহাকোষের অংশ-বিশেষ এবং অন্যান্য দোহাকোষের বিভিন্ন অংশ প্রকাশ করেন। এই সাহিত্য উপাদানের উপর নির্ভর করে সহজযানের মূলনীতি সম্পর্কে অস্পষ্ট ধারণা করা যায়। পরবর্তী বাঙলার সহজিয়া ধর্ম সহজযান থেকে উদ্ভূত। এই সহজিয়া ধর্মের আদি কবি বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও বৌদ্ধ সহজযানের মূল সূত্রগুলি ধরা যায়।

বজ্রযানের সূক্ষ্মতর স্তরের নাম সহজযান। বজ্রযানে মূর্তি, দেবায়তন, মন্ত্র, পূজা, আচার-অনুষ্ঠান খুব বেশি পরিমাণে ছিল। সহজযানে দেবদেবীর স্বীকৃতি ছিল না। সুতরাং মন্ত্র পূজা আচার-অনুষ্ঠান, সবই সেখানে অনুপস্থিত। সহজযানীরা বলতেন, কাঠ-মাটি-পাথরের তৈরি দেবদেবীর কাছে মাথা নোয়ানো বৃথা। তাঁদের কাছে বাহ্যানুষ্ঠানের কোন মূল্য ছিল না। তাঁরা ব্রাহ্মণের নিন্দা করতেন, মন্ত্র এবং জপ তপে রত বৌদ্ধদেরও রেহাই দিতেন না। তাঁরা বলতেন, যাঁরা এসব করেন, তাঁরা বুদ্ধত্ব লাভ করতে পারেন না। তাঁদের একটি দোহায় যা আছে, তার মর্মার্থ এই যে, দীপে, নৈবেদ্যে, মন্ত্রোচ্চারণে অথবা তীর্থে তপোবনে যেয়ে কী হবে? জলে স্নান করলেই মোক্ষলাভ হয় না। তাঁরা বলতেন, তরুণীর নিরন্তর স্নেহ ভিন্ন এই দেহে বোধিলাভ হয় না। পরমজ্ঞান লাভের সংবাদ সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা, স্বয়ং বুদ্ধদেবও জানতেন না। তাঁদের মতে সকলেই বুদ্ধত্ব লাভের অধিকারী এবং এই বুদ্ধত্বের অধিষ্ঠান দেহের মধ্যে। তাঁদের কাছে দেহবাদ অথবা কায়সাধনই একমাত্র সত্য। সহজিয়াদের মতে, শূন্যতা প্রকৃতি, এবং করুণা, পুরুষ। এই শূন্যতা এবং করুণা অর্থাৎ প্রকৃতি এবং পুরুষের মিলনে, অর্থাৎ নারী ও নরের মিলনযোগে বোধিচিত্তের যে পরমানন্দময় অবস্থার সৃষ্টি হয়, তাঁদের মতে, তাই মহাসুখ। এই মহাসুখই একমাত্র সত্য। এই সত্যের উপলব্ধি যদি হয়, তাহলে ইন্দ্রিয়গ্রাম, সংসারজ্ঞান, আত্মপর ভেদ, সংস্কার, সব লোপ পায়।

দশম-একাদশ শতাব্দীতে বাঙলায় একশ্রেণীর সাধক ছিলেন, যাঁদের রসসিদ্ধ যোগী বলা হত। তাঁরা মৃত্যুর পরে মুক্তিলাভে বিশ্বাস করতেন না। তাঁরা জীবনমুক্তির সাধক

ছিলেন। তাঁরা মনে করতেন যে, রস-রসায়নের সাহায্যে কায়সিদ্ধি লাভ করে, জড় দেহকেই সিদ্ধদেহ এবং সিদ্ধদেহকে দিব্যদেহে রূপান্তরিত করা সম্ভব। সহজযানী সিদ্ধাচার্যগণ এদের প্রতিও কটাক্ষ করেছেন। সরহ বলেছেন যে, তাঁরা (অর্থাৎ সহজযানীরা) অচিন্ত্যযোগী, জন্ম-মরণ সংসার কীভাবে হয়, তাঁরা জানেন না। জন্ম যেমন, মরণও তেমনই। জীবিতে ও মৃতে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। এই সংসারে যাঁরা জন্ম-মরণে ভয় পান, তাঁরাই রস-রসায়নের আকাঙ্ক্ষা করেন। সাধারণ যোগী সন্ন্যাসীদেরও সহজযানীরা ভীষণ অবজ্ঞা করতেন। সরহের একটি দোহায় আছে ঃ আর্যযোগীরা দেহে ছাই মাখে, মাথায় জটা রাখে, ঘরে বসে দীপ জ্বালে, কোণে বসে ঘণ্টা বাজায়। তারা চোখ বুজে আসন বাঁধে, আর কান খুসখুস করে জনসাধারণকে ধাঁধা লাগায়।

সাম্য ভাবনা এবং আকাশের মত শূন্য চিত্ত, এই সহজযানের আদর্শ। ধ্যানের মধ্যে মোক্ষ নেই, সহজ ছাড়া নির্বাণ নেই, কায়সাধন ভিন্ন পথ নেই। শরীরের মধ্যেই অশরীরীর গুপ্ত লীলা। সুতরাং বনে যাওয়ার প্রয়োজন নেই, ঘরে থাকারও প্রয়োজন নেই। আগম, বেদ, পুরাণ, সবই বৃথা। সহজের রূপ নিষ্কলুষ এবং নিস্তরঙ্গ। তার মধ্যে পাপ-পুণ্যের প্রবেশ নেই। সহজে মন নিশ্চল করে, যে সাম্য ভাবনা লাভ করেছে, সেই একমাত্র সিদ্ধ। তার জরা-মরণ থাকে না। শূন্য নিরঞ্জনই মহাসুখ। সেখানে পাপ নেই, পুণ্য নেই। একের পর এক দোহায় সিদ্ধাচার্যগণ এই মত ব্যক্ত করেছেন। তাঁরা বলতেন, বৈরাগ্য সাধনের চেয়ে বড় পাপ নেই এবং সুখের চেয়ে বড় পুণ্য নেই। সহজযানের যে মতবাদের কথা এখানে বলা হল, তা থেকে এটা স্পষ্ট যে, মধ্য যুগের মরমীয়া কবি সাধক, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস থেকে আরম্ভ করে কবীর, দাদু, তুলসীদাস ইত্যাদি সকলেই চিন্তার দিক থেকে সহজযানীদের উত্তরসূরী ছিলেন।

সহজযানীরা বেদ ব্রাহ্মণ মানতেন না, কিন্তু গুরুকে মান্য করতেন। তাঁদের মতে একমাত্র যোগ্য গুরুই শিষ্যকে রহস্যের দীক্ষা দেওয়ার অধিকারী। যে গুরুকৃপা লাভ করে, তার কাছে অপ্রাপ্যণীয় কিছু থাকে না। সরহ অযোগ্য গুরু সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন। গুরুর পক্ষে শিষ্যকে তার অভীষ্ট লক্ষ্যে নিয়ে যাওয়া সহজ ছিল না। সহজযানীরা মনে করতেন যে প্রত্যেক শিষ্যের একটি বিশেষ আধ্যাত্মিক প্রবণতা থাকে। এই প্রবণতাকে তাঁরা 'কুল' আখ্যা দিয়েছিলেন। এই কুলের সংখ্যা পাঁচ। সহজযানীরা তাদের নামকরণ করেছিলেন যথাক্রমে, ডোম্বী, নটী, রজকী, চণ্ডালী এবং ব্রাহ্মণী। জীবদেহের পাঁচটি মূল উপাদান, পঞ্চমহাভূত দ্বারা কুলের স্বরূপ নির্দিষ্ট হয়। এই পাঁচটি কুল হল, প্রজ্ঞা অথবা শক্তির পাঁচটি দিক। সাধকের পক্ষে সাধনার সময় তার বিশেষ শক্তিকে অনুসরণ করাই সর্বোৎকৃষ্ট কাজ। কুল যেহেতু পাঁচটি, তাই সহজযানের মতে সাধকও পাঁচ শ্রেণীর। সুতরাং গুরুর পক্ষে প্রথম কাজ হল শিষ্যের মধ্যে কোন্ কুলের প্রাধান্য, তা আবিষ্কার করা এবং সেই অনুসারে তাকে পরিচালনা করা।

সহজযানে এক নূতন ধরনের যোগ, সাধকের সাধনার অন্তর্গত ছিল। পূর্বে বলা হয়েছে যে, সহজযানীদের লক্ষ্য ছিল মহাসুখ লাভ। সহজযানীরা বিশ্বাস করতেন যে মস্তিষ্কের উচ্চতম প্রদেশে মহাসুখস্থানের অধিষ্ঠান। দেহের অভ্যন্তরে বত্রিশ নাড়ীর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে শক্তি সেই স্থানে পৌঁছোয়। তাঁরা এই নাড়ীগুলির বিভিন্ন নামও

দিয়েছিলেন, যেমন, ললনা, রসনা, অবধূতী, প্রবণা, কৃষ্ণা, কৃষ্ণরূপিণী, সামান্যা, সুষুম্না, কামিনী ইত্যাদি। এদের মধ্যে প্রথম তিনটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সহজযানের অবধূতী এবং ব্রাহ্মণ্য তন্ত্রের সুষুম্না একই। সহজযানীদের মতে দেহের অভ্যন্তরে পদ্মের পাপড়ি অথবা চক্রের মত বিভিন্ন স্থিতি-স্থান আছে এবং ঊর্ধ্বগামী শক্তি এই স্থানগুলি অতিক্রম করে। শক্তি এইভাবে মহাসুখস্থানে পৌঁছুলে, সাধকের মনোভাব কী হয়, পূর্বে বলা হয়েছে।

পরবর্তী বৌদ্ধ রহস্যবাদের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণনা করা হল। চর্যাপদে, বৈষ্ণবগীতি কবিতায়, সহজিয়া নাথ এবং বাউল সাহিত্যে এই বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করা যায়। শাক্ত ধর্মের সঙ্গে বৌদ্ধ রহস্যবাদের মিশ্রণের ফলে একদিকে যেমন নূতন শাক্ত ধর্মের, তেমন অন্যদিকে কয়েকটি লোকায়ত ধর্মের সৃষ্টি হয়েছিল। এই ধর্মগুলি এখনও বেঁচে আছে। এই ব্রাহ্মণ্য শাক্তধর্ম বর্ণাশ্রমকে স্বীকার করেছিল। কিন্তু অন্যদিকে লোকায়ত নাথ, অবধূত, সহজিয়া এবং বাউল সম্প্রদায় তা করে নি। নাথ সম্প্রদায় ক্রমশ হিন্দু সমাজে একটি পৃথক বর্ণরূপে স্বীকৃতি লাভ করেছিল।

নাথ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা মৎস্যেন্দ্রনাথ অন্যতম সিদ্ধাচার্য ছিলেন। সুতরাং সিদ্ধাচার্যগণের ধর্ম থেকে নাথ ধর্মের উৎপত্তি হয়েছিল, বলা চলে। নাথ ধর্মের ধর্মগুরুদের নাথ বলা হত। তাঁদের মধ্যে গোরক্ষনাথ, মীননাথ, চৌরঙ্গীনাথ ইত্যাদি বিখ্যাত। উত্তর এবং পূর্ববঙ্গে এই ধর্ম কিছু প্রভাব বিস্তার করেছিল।

অবধূতগণ সকলেই সন্ন্যাসী। তাঁরাও সিদ্ধাচার্যদের কাছ থেকে প্রেরণা পেয়েছিলেন। অবধূত নাম থেকে বোঝা যায় যে, এঁরা বৌদ্ধ যোগ সাধনায় বিশ্বাসী ছিলেন। বৌদ্ধ যোগে অবধূতী নাড়ীর প্রধান ভূমিকার কথা পূর্বে বলা হয়েছে।

প্রাক-চৈতন্য যুগে সহজিয়া বাঙলাদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। চৈতন্য আন্দোলন এর অগ্রগতিকে প্রতিহত করতে চেয়েছিল, কিন্তু তা করতে পারে নি। বরং চৈতন্য আন্দোলনই ক্রমশ সহজিয়া দ্বারা গভীর ভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীর ময়নামতী পট্টে সহজিয়ার প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। বাঙলাদেশে সহজিয়া বিষয়ে প্রথম লেখক চণ্ডীদাস।

বাউল সাহিত্যের ভগ্নাংশ মাত্র পাওয়া গেছে। সুতরাং তার উপর নির্ভর করে বাউলগণ বৌদ্ধ সহজযান কর্তৃক কতটা প্রভাবিত হয়েছিলেন, তা বলা যায় না। তবে মনে হয় সহজিয়াদের তুলনায় তাঁরা সহজযানের ঐতিহ্য অধিকতর রক্ষা করেছিলেন, কেননা বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব তাঁরা অস্বীকার করেছিলেন।

স্বতন্ত্র ধর্ম হিসাবে বৌদ্ধধর্মের অবসানের পর বাঙলাদেশে উপরোক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব বেঁচে ছিল। সহজ সুখ লাভই ছিল এই সব সম্প্রদায়ের মূল লক্ষ্য।

পাল-সেন আমলের শিল্প ঃ স্তূপ ও বিহার

পাল-সেন আমলের শিল্প বলতে স্থাপত্য, ভাস্কর্য এবং চিত্রকলা বোঝায়। স্থাপত্য বলতে বোঝায় স্তূপ, বিহার এবং মন্দির।

সাধারণভাবে স্তূপ সম্পর্কে ইতিপূর্বে শিল্পপ্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। চীন দেশীয়